ভাষার বাস্তুতন্ত্র ও বাংলা ভাষা

আবাহন দত্ত

সমাজকে যদি উল্লম্ব কল্পনা করা হয়, তবে তা একটি বাড়ির মতো। সেখানে সবচেয়ে উঁচু তলায় বাস করে শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিমান মানুষজন। তাদের নিজস্ব ভাষার ধরন রয়েছে। আর সবচেয়ে নীচে যে তলটি রয়েছে, সেখানে সাধারণত থাকেন আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ। তারা শিক্ষার হারে কমও বটে। তাদেরও রয়েছে নিজস্ব ভাষার ধরন। এগুলির চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্য রয়েছে মাঝের তলগুলিতে। এই মডেলটিকে বিশ্লেষণ করলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের পৃথক পৃথক ভাষা ব্যবহারের ধরন বুঝতে সুবিধে হবে। তবে সামাজিক স্তরায়নকে ধ্রুব বলে ধরে না নেওয়াই ভাল। তার কারণ প্রতিবেশ। সেই অনুযায়ী বক্তার ভাষার ধরন বদলে যেতে থাকে। মধ্যবিত্ত সমাজে দেখা যায়, কোনও কিশোর তার শিক্ষকের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলছে, তার বন্ধুদের সঙ্গে সেই ভাষায় কথা বলছে না। কাজেই সামাজিক পরিচয় স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোনও একটি মাপকাঠি বদলে গেলে ভাষাও বদলাতে পারে। কার সামনে কথাটা বলা হচ্ছে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ, চিহ্নিত করেছিলেন ফিশম্যান। এই বিষয়টিকেই গ্রাহক বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বাঙালি সমাজে বয়স, সম্পর্ক ও সামাজিক শ্রেণির উপর নির্ভর করে এটি। সেই অনুযায়ী তৈরি 'আপনি', 'তুমি' বা 'তুই' সম্বোধন।

সংক্ষেপে এ-ই হল সমাজভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত মূল কিছু কথা। সমাজভাষাতত্ত্বের কাজ কী? সামাজিক বিধিনিষেধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেক্ষাপট এই সব ক'টি ক্ষেত্রে ভাষা কী ভাবে ব্যবহৃত হয় তারই বর্ণনামূলক পড়াশোনা হল সমাজভাষাতত্ত্ব। ১৯৫২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এই পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছিল। এর পর, ১৯৬৪ সালে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমাজভাষাতত্ত্বের একটি সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে যে প্রবন্ধগুলি পড়া হয়েছিল, পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন উইলিয়াম ব্রাইট। তাঁর লেখায়, "Linguistic diversity is precisely the subject matter of sociolinguistics."[১] তিনি আরও জানান, এই বৈচিত্র্য বা 'diversity' শুধুমাত্র ভৌগোলিক নয়। এটি সামাজিক স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই এ কথা বলাই যায়, ভাষা সমাজে কী ভাবে ব্যবহৃত হয়, সে সম্পর্কেই কথা বলে সমাজভাষাতত্ত্ব। ফলে তা সমাজ-কাঠামোর

উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠীর নিরিখে সমাজের চেহারা কেমন দাঁড়ায়, তা-ও এর আলোচনার বিষয়। একে আর একটু অন্যভাবে দেখেন ভাষাতাত্ত্বিক জোশুয়া ফিশম্যান। তাঁর মত, ভাষার সমাজতত্ত্ব আলোচনা করতে গেলে সব সময় আমাদের কোনও না কোনও প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাওয়া উচিত। যেমন, 'কে বলছে', 'কোন ভাষা-বৈচিত্র্য', 'কাকে বলছে', 'কখন ও কোথায় বলছে' ইত্যাদি।

বক্তা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা জরুরি। ভাষার যে সাতটি মাত্রা ব্রাইট দেখিয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হল 'প্রেরক', অর্থাৎ বক্তা। এই ধারণাটি ডেল হাইমস-এর থেকে পাওয়া। 'দ্য এথনোগ্রাফি অব স্পিকিং' শীর্ষক প্রবন্ধে হাইমস জানান, ভাষার চরিত্র নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর: প্রেরক, গ্রাহক ও প্রতিবেশ। তাঁর মতে, এগুলি ভাষার শর্তসাপেক্ষ উপাদান (Conditioning factor)। তাই বক্তার সামাজিক পরিচয় জানা খুব জরুরি। আমাদের জানতে হয়, বক্তা সমাজের কোন স্তরে রয়েছেন, তিনি কতটা শিক্ষিত এবং তাঁর পেশা কী। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর লিঙ্গ। তা ছাড়া বয়স এবং পারিবারিক ইতিহাস জানতে পারলেও ভাল হয়। সাধারণ ভারতীয় সমাজে ধর্ম ও বর্ণ জানাও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সব ক'টি প্রশ্নের উত্তর মিললে তবেই এক ব্যক্তির ভাষা বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এবং এই ভাষা হল 'সমাজভাষা'। কারণ বিশেষ উপভাষাটি আসলে নির্ভর করে সমাজের উপর। ধাপে ধাপে সাজানো যুক্তি থেকে তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

পরিবর্তিত ভাষাভঙ্গিগুলির সৃষ্টি হয় তার ব্যবহারের দিকটি অনুসারে। পরিভাষায় একে বলে রেজিস্টার (Register)। ইংল্যাণ্ডের একদল ভাষাবিজ্ঞানী একে চিহ্নিত করেছিলেন 'Language according to use' বলে। মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী জোশুয়া ফিশম্যান দ্বিভাষিকতা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি পর্যবেক্ষণের কথা বলেছিলেন। সেখান থেকেই সামগ্রিকভাবে ব্যাপারটাকে বোঝা যাবে। ভাষা ব্যবহারের এলাকা (Domain) বিষয়ে ফিশম্যান আলোচনা করেছিলেন তাঁর 'The relationship between Micro and Macro-Sociolinguistics in the study of who speaks what language to whom and when'প্রবন্ধে। এলাকা বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন, একই সমাজে সমমানসিকতা সম্পন্ন ভাষা ব্যবহারকারী গোষ্ঠী। অনেক বহুভাষী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই এলাকাটি তৈরি হয়ে যায়। ভাষা নির্বাচন, মুখোমুখি কথা বলার সময় ভাষা ব্যবহার, সমাজ সংস্কৃতি নির্ভর পরিবেশ সবই ভাষা-এলাকার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। বলাই বাহুল্য, এলাকা নির্বাচন হয় অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে। ১৯৭২ সালে ফিশম্যানের প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যটি ছিল "The appropriate designation and definition of domains of language behaviour obviously calls for considerable insight into the socio-cultural dynamics of particular multilingual speech communities at particular periods in their history."[২] তাঁর ভাবনায়, বহুভাষিক দেশে দ্বিবাচনের উপস্থিতি দেখা যায়। যেখানে স্থানীয় ভাষা ও ধ্রুপদী ভাষা আছে, সেখানে তা ব্যবহৃত হয়। পৃথক পৃথক উপভাষা, রেজিস্টার বা নানা ধরনের ভাষাবৈচিত্র্য থাকলে, সেখানেও এই ব্যাপারটি লক্ষ করা

যায়। কোনো জায়গায় দ্বিভাষিক পরিস্থিতি কীভাবে সৃষ্টি তার জন্যে সে অঞ্চলের ভাষার ইতিহাসটা ঘাঁটা জরুরি। যেমন দক্ষিণ আমেরিকার দেশ প্যারাগুয়ে এককালে স্পেনের উপনিবেশ ছিল, তাই এখানকার একটি সরকারি ভাষা স্পেনীয়। অপরটি গুয়ারানি। কারণ স্থানীয় অধিবাসীরা মূলত নেটিভ অ্যামেরিকান। তাদেরই ভাষা গুয়ারানি। প্যারাগুয়ের ৯০% মানুষের ভাষা গুয়ারানি, ১০% মানুষের মাতৃভাষা স্পেনীয়। স্বভাবতই গুয়ারানি অনেকের দ্বিতীয় ভাষাও বটে। এটি স্বীকৃত জাতীয় ভাষা। অন্যদিকে, স্পেনীয় হল সরকারি ও শিক্ষার ভাষা। এখন অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে গুয়ারানির ব্যবহার শুরু হয়েছে। ১৯৫১ সালে এক হিসেব থেকে জানা যাচ্ছে, প্যারাগুয়ের অর্ধেকের বেশি মানুষ দ্বিভাষিক। সেটা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্তরে। গ্রামের দিকে খানিকটা একভাষিকতা দেখা গেলেও শহরের মানুষের প্রায় সকলে দ্বিভাষিক।

জার্মান ভাষাবিজ্ঞানী নরবার্ট ডিটমারের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, উপভাষা অঞ্চলের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মান্য হাই জার্মান ব্যবহার করলেও, বাড়িতে নিজেদের মধ্যে উপভাষাতেই কথা বলে। প্রসঙ্গত, 'উপভাষা' শব্দটি ব্যবহার করা উচিত কি না তা নিয়ে তর্ক রয়েছে। তবে সে সংক্রান্ত আলোচনা এখানে তোলা থাকল। সে বিষয়ে কথা বলার পরিসর এটি নয়। ডিটমারের ভাবনা অনুসারে, একজন মানুষের সামাজিক ব্যবহারের ভাষায় উপলক্ষ্য সংক্রান্ত বৈচিত্র্যের দুটি দিক থাকে। এক, সামাজিক বৈচিত্র্য (Social variety), অর্থাৎ বক্তার নিজের ভাষা বৈচিত্র্য। দুই, ক্রিয়াগত বৈচিত্র্য (Functional variety), অর্থাৎ বক্তা শ্রোতার ভাবের আদানপ্রদান, কথাবার্তা আনুষ্ঠানিক না ঘরোয়া, বিশেষ রীতি ও ব্যবস্থা অনুসারে ভাষার বৈচিত্র্য। এক্ষেত্রে ঘটে বিকল্পন, অর্থাৎ একটির বদলে আরেকটি বলা। পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলগুলির পরিস্থিতিও জার্মানির বিশেষ ক্ষেত্রটির অনুরূপ। এখানেও দুটি ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্র পৃথক। এঁরা মাতৃভাষা ব্যবহার করেন বাড়িতে। নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম ওটাই। তাই সেটিই তাদের প্রথম ভাষা বা First Language (L1)। বাংলা তাঁদের কাজের ভাষা। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু। আরো গুরুত্বপূর্ণ হল, স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা। সুতরাং তাগিদেই এটি তাঁদের অর্জন করতে হয়। বাংলা তাঁদের দ্বিতীয় ভাষা বা Second Language (L2)।

দু'টো ভাষা সমান্তরালভাবে ব্যবহার করতে গেলে টানাপোড়েন তৈরি হবেই। আর সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত জিতবে ক্ষমতাশালীই। এটাই ভবিতব্য। কিছু সংস্কার বশে কম সম্ভ্রমের ভাষা গোড়ার দিকে শক্তি পেলেও শেষে আর সে পারবে না। তার উপর প্রভাব বিস্তার করে নেবে অধিক ক্ষমতাশালী। বলাই বাহুল্য, এই ক্ষমতার পিছনে থাকে রাষ্ট্রশক্তি। রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে ভাষার সংযোগ এতটাই নিবিড়। অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তী লিখছেন, "ভাষার সমাজতত্ত্বে ক্ষমতার সম্পর্ক বিশেষ ভূমিকা নেয়।... অনেক সময় উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ভাষা শাসন ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং সাধারণ নিম্ন বা ক্রেয়লায়িত ভাষায়

সেই সঙ্কেত ব্যবহার করা হয়। একে দ্বিভাষিকতা বলা হয়।"[৩] এখানে সংকেত বিষয়ে কয়েকটি কথা বলতেই হয়। সংকেতের ইংরেজি পরিভাষা হল কোড। সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষাকে কোড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দেখা যাচ্ছে, একটি কোড ব্যবহার করতে করতেই তার মাঝে এসে পড়ছে আরেকটি কোড। একে বলা হচ্ছে কোড মিক্সিং (Code mixing)। কখনো আবার একটি কোডে কথা বলতে বলতে বক্তা চলে যান অন্য কোডে। এটি হলো কোড সুইচিং (Code switching)। দুটি বৈশিষ্ট্যকে একসঙ্গে করে সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে বলে কোড শিফটিং (Code Shifting)। বিদ্যাধরপুরে এই শিফটিং খুব বেশিই দেখা যায়। একে অন্যের ধ্বনিতাত্ত্বিক ও পদাণুতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি মিশে যাওয়ার ব্যাপারটাও রয়েছে এভাবেই। ফিশম্যানের ভাবনায়, কোড সুইচিং ব্যাপারটি আসলে 'Situational shifting'। এক ভাষাবৈচিত্র্য থেকে অন্য ভাষাবৈচিত্র্যে চলে যায় ব্যবহারকারীরা অবস্থা, পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে। তাই একজন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই একাধিক ভাষা ব্যবহার করতে পারেন। বহুভাষিক দেশে যে উদাহরণ হামেশাই দেখা যায়। যেমন, পাহাড়ি 'শেরপা' জনজাতির মানুষেরা। বাড়িতে শেরপা বলেন। বাইরে মূলত নেপালি, পাশাপাশি হিন্দি ও ইংরেজি বলতে হয় ক্ষেত্রবিশেষে। আবার তাঁদের ধর্মগ্রন্থ তিব্বতি ভাষায় লেখা। ফলে শিখতে হয় সেই ভাষাও। যাই হোক, ক্ষমতার প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ভাষার মূল্য নির্ণীত হয় রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ঘটনাচক্রে। মারিয়ো পেই নামে এক ভাষাতাত্ত্বিক ভাষার প্রাধান্য ও প্রতিপত্তির এক সূচক তৈরি করেছিলেন। সেখানে গুরুত্বের দিক থেকে ভাষী সংখ্যা ২৫%, ভৌগোলিক বিস্তার ১৩%, সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ৭%, শিক্ষিতের হার ৬%। এছাড়া বাকি সূচকগুলি হল ভাষার বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে অবদান, বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তা, সাংস্কৃতিক মূল্য। আলোচ্য পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণই বিশেষ ভাষাটির (অর্থাৎ বাংলা) প্রসারের কারণ। অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ লিখছেন, "কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে পৃথিবীতে মানুষকে প্রধান এবং অপ্রধান ভাষার একটা পার্থক্য স্বীকার করে নিতে হবে। পৃথিবীতে কতকগুলি ভাষা প্রধান, সেই অর্থেই গুরুত্বপূর্ণ, কতকগুলি অপ্রধান অর্থাৎ তাদের গুরুত্ব কম। যে গোষ্ঠী একটি অপ্রধান ভাষায় কথা বলেন ... সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণেই সাধারণত তাদের একটি প্রধান ভাষা লিখতে হয়।"[৪]

ফিশম্যান লিখছেন, দ্বিবাচন ব্যাপারটি রয়েছে স্থিতিশীল দ্বিভাষী সমাজে। অস্থিতিশীল দ্বিভাষী সমাজে তা নেই। স্থিতিশীল সমাজে জীবনের নানা ক্ষেত্রে দু'টি ভাষাকে ব্যবহার করা হয়। মনে রাখতে হবে, মাতৃভাষা এবং অন্যান্য ভাষা ব্যবহারের এই ক্ষেত্র কিন্তু বেশ কঠোর। স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এখানেই উপলক্ষ্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ডিটমারের গবেষণা থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সেই ধারণাই প্রযুক্ত হচ্ছে বিদ্যাধরপুরের ক্ষেত্রেও। অস্থিতিশীল বা অস্থির দ্বিভাষিকতা প্রসঙ্গে ফিশম্যানের বক্তব্য নিয়ে আলোচনায়

অধ্যাপক পবিত্র সরকার লিখছেন, "...বৃহৎ গোষ্ঠীবদ্ধ না হলে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় তাদের নিজেদের ভাষাকে সংকুচিত করতে করতে একসময় তা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে নতুন প্রজন্ম নতুন সমাজের, অর্থাৎ চারপাশের জনগোষ্ঠীর ভাষাই শিখতে ও বলতে শুরু করে।"[৫] এই সব এলাকায় ভাষা সংরক্ষণ ও ভাষার মৃত্যু বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলে। আসলে কোনো একটি জনগোষ্ঠী কোন ভাষা সমাজের কোন কাজের জন্যে ব্যবহার করছে, তার উপরেই নির্ভর করে স্থায়িত্ব। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্যে চালু ভাষাটিই প্রধান হয়ে ওঠে। দুর্বল হয়ে পড়ে জনগোষ্ঠীর আদি মাতৃভাষা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক এলাকা থেকে বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন পবিত্র সরকার। মার্কিন অভিবাসী জনগণের ক্ষেত্রে ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটে থাকে। সে দেশে সর্বক্ষেত্রে ইংরেজির চল। এরই বিপ্রতীপে কোনো কোনো এলাকায় একসঙ্গে অনেকে বসবাস করার কারণে আদি ভাষার 'পকেট' টিকে আছে। যেমন মিনেসোটা রাজ্যে জার্মান ও নরওয়েজীয়দের কয়েকটি উপনিবেশে এ ছবি দেখা যায়।

মার্কিন দেশ একভাষী। তাই সেখানকার দ্বিভাষিকতা অস্থির। সেই ক্ষেত্রে কোনো ভাষার প্রয়োগ ক্ষেত্রে প্রাধান্যের ব্যাপারটি ফিশম্যান দেখিয়েছেন চার পর্যায়ে। মার্কিন অভিবাসীদের ভাষা-অর্জন ও রক্ষণের সময় প্রয়োগক্ষেত্রে অতিক্রম করে যাওয়ার একটি ব্যাপার থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অতিক্রমী, প্রথম ও চতুর্থ অনতিক্রমী। একে অপরের উপর নির্ভরশীল যৌগিক দ্বিভাষিকতায় দ্বিতীয় স্তরে অনেক অভিবাসীই বেশি ইংরেজি জানে। তারা একে অপরের সঙ্গে মাতৃভাষা ছাড়াও ইংরেজি কথা বলতে পারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। অবশ্য সেটা মাতৃভাষার মধ্যস্থতার দ্বারাই সম্ভব হয়। প্রথম স্তরে তারা মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরেজি শিখছে। যে সব জায়গায় মাতৃভাষা ব্যবহার সম্ভব নয়, শুধুমাত্র সে সব ক্ষেত্রেই ইংরেজি ব্যবহার করছে তারা। অল্প অভিবাসীই ইংরেজি জানে এই স্তরে। স্বতন্ত্র বা বিশ্লিষ্ট দ্বিভাষিকতায় তৃতীয় স্তরে ভাষাদু'টি কাজ করে পৃথকভাবে। এখানে দ্বিভাষিকদের সংখ্যা সর্বাধিক। চতুর্থ স্তরে সীমিত ক্ষেত্র ব্যতীত সর্বত্রই মাতৃভাষাকে স্থানচ্যুত করে ইংরেজি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাষাদু'টি আলাদাভাবে ক্রিয়াশীল। মজার ব্যাপার, ইংরেজিই এখানে মাতৃভাষাকে মধ্যস্থতা করছে। আজ কলকাতা শহরের বাঙালিদের মধ্যেও এই চারটি স্তরই দেখা যাবে। বাংলার সঙ্গে সংঘাতটা সেখানেও ইংরেজির।

এই আলোচনায় 'Lingua Franca' বিষয়ে কিছু কথা বলতে হয়। সেক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানী পিটার ট্রাডগেলের '*Sociolinguistics- An Introduction to Language and Society*' বইটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেখানে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে ভাষাসংযোগ বিষয়টিকে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে উপস্থাপিত 'পিজিন' ও 'ক্রেয়ল' বিষয়ক বক্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। তবে 'Lingua Franca'কী? এটি হল পৃথক ভাষাভাষী মানুষের মধ্যেকার সেতু ভাষা বা বাণিজ্য ভাষা, যার মাধ্যমে তাদের মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব হয়। সাধারণত এটি দুই পক্ষের মাতৃভাষার থেকে আলাদা তৃতীয়

কোনো ভাষা হয়। যেমন আজ একুশ শতকে বিশ্বের অনেক প্রান্তেই 'Lingua Franca' ইংরেজি। ফরাসি, স্পেনীয়, উর্দু, হিন্দি, পর্তুগিজ, রুশ, আরবি, মান্দারিন, সোয়াহিলি এই সব ভাষার মানুষদের মধ্যে সেতু ভাষা ইংরেজি। কোনো কোনো বহুভাষী দেশে জাতীয় ভাষা হয় একটি 'Lingua Franca'। যেমন আমাদের প্রতিবেশি পাকিস্তানে উর্দু। ইন্দোনেশিয়ায় জাভানিজ, বালিনিজ, সুন্দানিজ, বাতাক, লোম্বারা ইত্যাদি মাতৃভাষা থাকলেও জাতীয় ভাষা ইন্দোনেশীয়। ঠিক তেমনই পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ভাষা বাংলা। একজন মুণ্ডারি যদি একজন রাজবংশীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, তবে তাকে বাংলাই ব্যবহার করতে হবে। ওটাই সেতু ভাষা। ঠিক একই চিত্র রাজ্যের উত্তরের জেলা দার্জিলিঙে। সেখানকার তিনটে মহকুমায় সরকারি ভাষা নেপালি। এই পাহাড়ি এলাকায় অসংখ্য জনজাতির মানুষ বাস করেন। যেমন লেপচা, লিম্বু, ভুটিয়া। তাদের প্রত্যেকের ভাষা আলাদা। এদের যোগাযোগের সেতু ভাষা নেপালি। তবে দেখা যাচ্ছে, বাংলা 'Lingua Franca' হিসেবে না থেকে তার গণ্ডিকে অতিক্রম করে যাচ্ছে।

বাংলা এখানে বেশি প্রভাবশালী। তাই কিছু বক্তার মাতৃভাষাকে সরিয়ে দিতে পারছে সে। বাধ্যত বাংলা ব্যবহারের চিত্রটির সাক্ষী হচ্ছি আমরা। হারিয়ে যাচ্ছে এক প্রান্তীয় ভাষা। তবে এখনো পর্যন্ত তুল্যমূল্য বিচারে দুটি ভাষা সমানভাবে রয়েছে। তাই ভাষাবিজ্ঞান বলছে, আপাতত পরিস্থিতি স্থিতিশীল। মাতৃভাষাকে খানিকটা রক্ষা করার চেষ্টা রয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভাষা ব্যবহারে যে মাতৃভাষা বজায় থাকার নমুনা দেখা যাচ্ছে না, তা স্পষ্ট। তাদের উচ্চারণে বাংলার কাছাকাছি আসার চেষ্টা। ঠিক যেমন অনেক উচ্চবিত্ত বাঙালির মধ্যেই আজ টানাপোড়েন চলে বাংলা আর ইংরেজির। পারিভাষিকভাবে একে বলে 'প্রেস্টিজ মোটিভ' (Prestige Motive)। এই সম্মানের ধারণাটি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায় ভিত্তিস্বরূপ বলা যায়। আর ঠিক সকলের মতোই ক্ষমতা আর পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিততে পারে না কোনো ভাষা। কারণ যে যে পথে ক্ষমতা বা পুঁজি আক্রমণ করতে পারে, সেই চেনা ছকে দখলের কাজটা হয়েই গিয়েছে।

এখানে একটা সুন্দর উপমা ব্যবহার করা হয়। বাংলায় যাকে 'বাস্তুতন্ত্র' বলে, ইংরেজিতে তার পরিভাষা 'ইকোলজি' (Ecology)। এর সংজ্ঞা হল, পরিবেশ ও জীবদেহের মধ্যে আদানপ্রদানকে বলা হয় 'ইকোলজি'। গ্রিক শব্দ 'ওইকোস' (Oikos) অর্থাৎ বাড়ি-র সঙ্গে 'লজিয়া' (logia), অর্থাৎ পড়াশোনা, পরসর্গ যোগ করে 'ইকোলজি'র জন্ম। জীববিদ্যা, ভূগোল ও পৃথিবী বিজ্ঞান এই তিন ক্ষেত্র জুড়েই গড়ে উঠেছে এই আন্তঃসম্পর্কযুক্ত বিদ্যাচর্চা। পরিবেশে জীবদেহের নিজেদের মধ্যে, অন্য কোনও উপাদান অথবা জড় বস্তুর সঙ্গে যে আদানপ্রদান, সে বিষয়ে আলোচনা চলতে পারে এই ক্ষেত্রে। এ বার জীববিজ্ঞান শব্দটিকে সরিয়ে, যদি তার জায়গায় বসানো হয় ভাষাবিজ্ঞানকে? তা হলেও এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে একটি স্বতন্ত্র চিন্তা গড়ে তোলা সম্ভব। এবং 'ভাষাতাত্ত্বিক বাস্তুতন্ত্র' (Linguistic ecology) বলে একটি পরিভাষাও প্রচলিত। ১৯৬৭ সালে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনা রাজ্যের ভাষিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত আলোচনায় এই পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। পরবর্তী কালে শব্দটিকে আরও বিস্তৃত পরিধিতে প্রয়োগ করেন মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক আইনার হাউগেন। বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ভাষার মধ্যে সম্পর্ককে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্রের এমন একটি উপমা প্রয়োগ করেছিলেন তিনি। এই পরিভাষার নাম 'ভাষাতাত্ত্বিক বাস্তুতন্ত্র' (Linguistic ecology) অথবা 'ভাষার বাস্তুতন্ত্র' (Language ecology) অথবা 'বাস্তুভাষাতত্ত্ব' (Ecolinguistics)। বিভিন্ন ভাষা কীভাবে নিজেদের মধ্যে আদানপ্রদান ঘটায় এবং সেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তা নিয়ে আলোচনা করে বিদ্যাচর্চার এই শাখা। বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করার মতোই, এই যুক্তি বলে রক্ষা করতে হবে বিপন্ন ভাষাকে। উপমাগত চেহারার পাশাপাশি সমাজভাষাতত্ত্বের শাখা হিসেবেও একে চিহ্নিত করেন অনেকে। এর কারণ, মানুষ বা অন্যান্য জীবদেহের বাঁচা-মরার সঙ্গে কোনও যোগ নেই। বরং, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ ও তার ভাষা।

পশ্চিমবঙ্গকে যদি একটি ভাষাতাত্ত্বিক বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে হিসেবে ধরা যায়, তা হলে সেখানে পিরামিডের চুড়োয় থাকবে বাংলা ভাষা। আমাদের রাজ্যে, বাঙালির জাতিগত আধিপত্যের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে বাংলা-কেন্দ্রিকতা। এর ফলে শিক্ষানীতিও নির্ধারিত হয় এই পথেই। ভাষার ক্ষেত্র বিস্তারে সেটাই সবচেয়ে জরুরি মাপকাঠি। এই কারণে, পশ্চিমবঙ্গে একটু একটু করে বিপন্ন হয়ে চলেছে বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষা। সেই সব ভাষাকে বাঁচাতে গেলে প্রথম কাজ হল তার দলিলায়ন। সঙ্কটের জায়গাটি বোঝাতে বিশ্বের অন্য প্রান্তেরও কয়েকটি উদাহরণ প্রয়োজন। যেমন, সোয়াহিলি ভাষার চাপে হারিয়ে যেতে বসেছে পূর্ব আফ্রিকার বেশ কিছু প্রান্তিক ভাষা। যেমন, ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ-এর মতো ইউরোপীয় ভাষার চাপে প্রবলভাবে বিপন্ন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বহু স্থানীয় ভাষা।

থাকুক আরও একটি উপমা। ধরা যাক, হঠাৎ দেখা গেল ফুটপাতে একজন অসুস্থ মানুষ পড়ে রয়েছেন। অতঃপর কী কর্তব্য? তিন রকম কাজ করা যেতে পারে। এক, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এর মাধ্যমে তিনি সুস্থ হতে পারেন। একটা ভাল কাজ হতে পারে সেটা। এটা কাজের কাজ হলেও, এ জন্য বড়ো স্বীকৃতি না-ও মিলতে পারে। দুই, ফুটপাতে পড়ে থাকা অসুস্থ লোকের ছবি অথবা ভিডিয়ো তুলে নেওয়া। যতক্ষণ না তিনি প্রাণত্যাগ করছেন কিংবা কেউ তাকে চিকিৎসার জন্য তুলে নিয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ এই কাজটা করে যেতে হয়। এই ক্ষেত্রে মানুষটিকে সরাসরি কোনও সাহায্য করা হয় না। বরং, সকলের সামনে জগতের 'অমানবিক' মুখটা তুলে ধরা হয়। যিনি ছবি তুলছেন, তিনি ব্যক্তির পাশে থাকলেও, বাস্তবে কোনও সাহায্য করছেন না। তবু, 'অমানবিক' তকমা পাবেন বাকিরা। যিনি সাহায্য না করে কেবল ঘটনাটির দলিলায়ন করে গেলেন, এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্তকে ক্যামেরাবন্দি করে রাখার জন্য তিনি কৃতিত্ব অর্জন

করবেন। তাকে কেউ 'অমানবিক' বলবেন না। এমনকি, বলার কথা ভাববেনও না। প্রশ্ন উঠবে না, সাহায্য না করে ছবি তুলছিলেন কেন? তিন, অসুস্থ লোকটিকে অগ্রাহ্য করে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া।

বিষয়টিকে ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে কেমন দাঁড়াবে এই তর্কটা? আসলে, বিপন্ন ভাষার দলিলায়ন হয়, তাকে বাঁচানোর কোনও প্রয়াস কম। মান্য বাংলার চাপে অন্যান্য উপভাষা এখন বিপন্ন। এ কথা বহু আলোচিত। উপভাষার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ করে তা নিয়ে লেখালেখি হয়েছে, হচ্ছে। তবু সক্রিয়ভাবে সেই চেহারাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ তেমনভাবে চোখে পড়ে না। অপর পক্ষে, ভাষাতত্ত্ব তথা বিদ্যাচর্চার কাজই নয় এটা। তার কাজ চিহ্নিতকরণ, দলিলায়ন, বিশ্লেষণ। আর ভাষা বহমান বিষয়। কালের নিয়মে তার চেহারা বদলাবে। মানুষের মুখে মুখেই তার জীবন-মৃত্যু। এমন জিনিসকে জোর করে আটকে রাখা বা ফেলে দেওয়া যায় না। সুতরাং, কালের নিয়মে যা হচ্ছে, তাকে পর্যবেক্ষণ করে যেতে হবে। এই প্রবন্ধে বিদ্যাচর্চার সেই কাজটিই করা হয়েছে। তবু, আবেগের জায়গা থেকে মাঠে নেমে কাজ করার প্রসঙ্গটাও এক বার ছুঁয়ে যাওয়া হল। আরও কোথাও এমন আশার কথা উঠে আসতেই পারে। আসলে বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করা যে মানুষ হিসেবে কর্তব্য, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকার কারণ নেই।

এ প্রসঙ্গে ভাষা সম্পর্কে সামাজিক সম্মান বা ধারণার প্রসঙ্গ বলতেই হয়। মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী উইলিয়াম লেবভের গবেষণাটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের মার্থা'স ভাইনইয়ার্ড দ্বীপে মৎস্যজীবী মানুষদের মধ্যে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছিলেন লেবভ। সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের উচ্চারণে যৌগিক স্বর (Diphthong) 'আই' এবং 'আউ' নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন তিনি। তাতে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কমবয়সী মৎস্যজীবীদের উচ্চারণ বেশ খানিকটা বদলে গিয়েছে। তা অনেকটাই বিদেশী পর্যটকদের মতো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই প্রভাব মোটেই নেই বয়স্কদের উচ্চারণে। এর কারণ কী? বিদেশীদের উচ্চারণকে বেশি সম্ভ্রমের মনে করছে অল্পবয়সীরা। কিন্তু স্থানীয় সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছেন প্রাচীনেরা। তাই তাদের উচ্চারণে সেই অনুগামিতা চোখে পড়ে না। লেবভ এই একই এলাকাতে মোট দুবার গিয়েছিলেন। তার ফলেই পর্যবেক্ষণে এই তফাতগুলো উঠে এসেছিল। তাঁর গবেষণাতেই প্রথমবার উঠে আসে, ভাষার ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচের ধারণার ফলে কীভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় 'স্টেটাস'। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই বাঁধা হয় ভাষাকে, যাকে বলে পরিকল্পনা।

কোনও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রশাসন যখন ওই অঞ্চলের ভাষার পরিস্থিতি এবং উপাদান বদল করে, তাকে বলে ভাষা পরিকল্পনা। এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। এক, বহুভাষিক অঞ্চলে কাজকর্মের সুবিধার্থে এটি করা হয়। দুই, ভাষার নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমিকা নিতে পারেন বিদ্বজ্জন অথবা প্রশাসক। তিন, ভাষার গভীর বা উপরিতলের কাঠামো পরিবর্তনের জন্য এ কাজ করা হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রের ভাষা পরিকল্পনায় এভাবেই ঢুকে পড়ে অসাম্য। কারণ, বহুভাষিক অঞ্চলে সব ভাষা কখনওই সমান সম্মান পায় না। ভারতের সংবিধানের দ্বাদশ অধ্যায়ে 'ল্যাঙ্গুয়েজেস অব দ্য ইউনিয়ন' অংশের ৩৪৩ থেকে ৩৫১ ধারার মধ্যে ভাষার একটি নির্দিষ্ট ক্রম উল্লিখিত হয়েছে।

১. সরকারি ভাষা: ইংরেজি ও হিন্দি

২. স্থানীয় ভাষা: বাংলা, মরাঠি, তামিল, অসমিয়া ইত্যাদি (রাজ্য স্তরের সরকারি ভাষা)

৩. 'গণতন্ত্র'-এর ভাষা: সাধারণ মানুষ যে কোনও ভাষায় কথা বলতে পারেন

এ ছাড়াও অষ্টম তফসিলে (৩৪৪(১) থেকে ৩৫১ ধারা) স্বীকৃত রয়েছে ১৮টি ভাষা। সেগুলি হল অসমিয়া, বাংলা, গুজরাতি, হিন্দি, কন্নড়, কোঙ্কনি, কাশ্মীরি, মণিপুরি, মলায়লম, মরাঠি, নেপালি, ওড়িয়া, পঞ্জাবি, সংস্কৃত, সিন্ধি, তামিল, তেলুগু, উর্দু।

সমাজভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বক্তার শ্রেণি বিভাগ করেছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক জন গাম্পার্জ। কম জটিল সমাজ থেকে বেশি জটিল সমাজের পথে স্তরায়ন ঘটেছে সেখানে। সেগুলি হলো: ১. শিকারি ও বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা। ২. বড়ো জনজাতির ভাষা। ৩. জটিল প্রশাসন ও অর্থনৈতিক শ্রেণিতে বিভক্ত সমাজের ভাষা। অন্য দিক থেকে আবার দু'টি শ্রেণি দেখিয়েছিলেন তিনি সাধারণ ও বিশেষ ভাষা। দ্বিতীয় শ্রেণির ভাষা গোষ্ঠীর বাইরের সদস্যেরা বুঝতে পারেন না। সেগুলিকে সাংকেতিক ভাষা (Code language) বলা যেতে পারে। কোনও গোষ্ঠী নিজেদের আলাদা করতে চাইলে এই ভাষা ব্যবহার করতে পারে। কখনও স্থানীয় উপভাষারও নিজস্ব চেহারা থাকে। আর সাধারণ ভাষা থাকে এর উপরের স্তরে। এ ছাড়া ব্যক্তির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যাকে বলে নিভাষা (Idiolect), তো রয়েছেই। ১৯৫১ সালে এক দল বিশেষজ্ঞ ভাষার স্তরায়ন করেছিলেন, যার ভিত্তিতে ভারতের ভাষাগুলিকে চারটি স্তরে ভাঙা যায়:

১. জাতীয় ভাষা: হিন্দি, ইংরেজি

২. তফসিলি ভাষা: অসমিয়া, বাংলা, গুজরাতি, কন্নড়, হিন্দি, তামিল

৩. সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা: লেখাপড়ার মাধ্যম হিসেবে ৪১টি ভাষা, পড়ানোর বিষয় হিসেবে ৫৮টি ভাষা, গণমাধ্যমে ৮৭টি ভাষা

৪. স্থানীয় অঞ্চলের ভাষা: ১৯০টি ভাষারূপ, ১৬৫২ 'মাতৃভাষা' (১৯৬১ আদমশুমারি)

এখানে অবশ্যই প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং স্তরবিভাজনের বিষয়টি কাজ করে যায়। সামাজিক ক্ষমতার প্রশ্নটিও থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনাও গুরুত্বপূর্ণ।

নীচে কয়েকটি প্রশ্ন সাজান রইল। ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সেগুলি জরুরি।

১. ভাষাটির কি নিজস্ব লিপি রয়েছে? সেই লিপি কি ছাপা সম্ভব? তার বানানবিধি কতটা পরিকল্পিত?

২. বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন ভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রে কি ভাষাটির শব্দভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ? তাতে কি অনেক পরিভাষা রয়েছে?

৩. ছাত্র এবং বিদ্বজ্জনদের জন্য ভাষার নিয়ম সংবলিত কোনও অভিধান কি রয়েছে?

৪. পড়ানোর মতো ব্যাকরণ বিধি কি রয়েছে ভাষাটির?

৫. ভাষাটির সাহিত্য কতটা সমৃদ্ধ?

এই সব মিলিয়েই গড়ে ওঠে ভাষার উপাদান পরিকল্পনা। ভাষার চেহারাকে নির্দিষ্ট পথে গড়ে নিতেই এই পদক্ষেপ। তাই ভাষার মান্যায়ন, আধুনিকীকরণ ও চিহ্ন নির্মাণ হল পরিকল্পনার মূল হাতিয়ার।

মূলত তত্ত্বকেন্দ্রিক হল আলোচনা। তবে যে সব কিছুর ভিত্তি করে এত তত্ত্ব, সেই সংক্রান্ত উদাহরণও দেওয়া প্রয়োজন। নীচে দেওয়া হল তেমনই তিনটি অঞ্চলের কথা।

১. শান্তিনিকেতনের কাছে বিদ্যাধরপুর গ্রামের বিভিন্ন বয়সের মানুষদের ব্যবহৃত বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও পদাণুতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি, তাঁদের বাংলায় ব্যবহৃত কিছু ভিন্‌জাতীয় শব্দের কথাও উল্লেখ করা হল।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে সাজিয়ে দেওয়া হল

ক. এখানে মূলত একটি 'স'-এর ব্যবহার দেখা যায়, সেটি দন্ত্য স। তালব্য শ বা মূর্ধন্য ষ দেখা যাচ্ছে না। উদাহরণ: শ্বাস > সাস, ষাট > সাট।

খ. মান্য উচ্চারণে যে স্থানে 'ও' ব্যবহৃত হয়, সেখানে 'উ' বলছেন এঁরা। আবার 'অ'-এর জায়গায় বলছেন 'ও'। উদাহরণ: সময়ে > সুময়ে, ঘরে > ঘোরে, গোলা > গুলা, তখন > তুখোন, ঘণ্টা > ঘুণ্টা, পৌষ > পুস, তোমাদের > তুমাদের।

গ. শ্বাসাঘাতপ্রধানতার কারণে উচ্চারণে দ্বিত্বের আধিক্য দেখা যায়। উদাহরণ: চোখে > চুখ্‌খে, এখনি > এখ্‌খোনি।

ঘ মান্য উচ্চারণের 'অ্যা' ধ্বনিটি এঁদের উচ্চারণে হয় 'এ'। উদাহরণ: অ্যাকদিন > একদিন

ঙ. অপিনিহিতি বা বিপর্যাসের ফলে শব্দের মধ্যে আগত স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ লক্ষ করা যায়। উদাহরণ: চলছে > চুইলছে।

২. সুন্দরবনের কিছু জায়গায় প্রচলিত সুন্দরী ভাষা। ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে যাঁরা গাছ মাছ ধরেন, মধু সংগ্রহ করেন, কাঠ কাটেন, তাঁদের কারও কারও মধ্যে শোনা যায় এই ভাষা। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল

ক. মান্য উচ্চারণের 'ও', এঁদের মুখে হয়ে যায় 'আ'। উদাহরণ: আরম্ভ > আরাম্ভো

খ. অঘোষধ্বনি রূপান্তরিত হয় ঘোষে। উদাহরণ: শাক > শাগ

গ. পরিচিত 'জ' ধ্বনি স্থানীয় ধরনে 'ক' হয়ে যেতে পারে। উদাহরণ: মেজাজ > মেজাক

৩. জলপাইগুড়ি জেলায় গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ভিতর বেশ কয়েকটি বনবস্তি রয়েছে। সে রকমই একটির নাম চ্যাংমারি। সেখানকার বাংলা উচ্চারণ বেশ স্বতন্ত্র। কয়েকটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তুলে দেওয়া হল

ক. যুক্তধ্বনি ভেঙে যেতে পারে। উদাহরণ: গ্রাম > গারাম

খ. শব্দের শুরুতে ধ্বনি লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। উদাহরণ: রাস্তা > আস্তা

গ. আদিধ্বনি স্থানীয় ধরনে বদলে যায়। উদাহরণ: লাল > নাল

বাংলার চেহারা আসলে বহু রকম। তবু একটা চেহারায় সকলের সামনে আসে, ফুটে ওঠে। সেই রাজনীতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। সব শেষে গুরুত্বপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক রবার্ট ফিলিপসনের ভাবনা। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কেন কিছু ভাষাই বিকশিত হয়, সব ভাষা নয়? কেন এবং কীভাবে ইংরেজির অবস্থান এত দৃঢ়? প্রাক্তন ঔপনিবেশিক ভাষাগুলি এখনও ব্যবহার করে যাওয়ার পিছনে ঠিক কি যুক্তি খাড়া করা হয়? নিজের এলাকা ছাপিয়ে অন্যের এলাকায় শাসনক্ষমতা দখল করলে, তা যেমন ঔপনিবেশিকতা, ভাষার ক্ষেত্রেও তাই। ঠিক সেই পথেই ইংরেজ বিদায়ের সত্তর বছর পরেও ইংরেজি বহন করে চলেছে ভারত। যুক্তি প্রচুর রয়েছে। তবে তা আধিপত্যের যুক্তি। অন্য ভাষাকে উপভাষা বলে চিহ্নিত করার মধ্যে গৌরবের কিছু নেই। কারণ সে ক্ষেত্রে নিজেকে জাতি আর 'অন্য'কে জনজাতি বলে চিহ্নিত করা হয়। ভাষার উপনিবেশ আসলে সকলেরই প্রবণতা। তাই তো এত পরিকল্পনা।

সুতরাং, বাংলা বলতে কী বুঝব উত্তরটা সহজ নয়। ভাবার প্রয়োজন আছে। আর প্রয়োজন আছে সব রকমের বাংলার স্বীকৃতির। তবেই সুস্থ থাকবে ভাষার বাস্তুতন্ত্র।

উদ্ধৃতিসূত্র

১. *Bright, William. Sociolinguistics : Proceedings of the UCLA Sociolinguistics Conference*, 1964. The Hague : Mouton & Co Publishers, 1985, Second Printing

২. উদয়কুমার চক্রবর্তী, *ভাষাবিজ্ঞান*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬, প্রথম প্রকাশ, পৃ ২৫৬

৩. উদয়কুমার চক্রবর্তী, *ভাষাবিজ্ঞান*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬, প্রথম প্রকাশ, পৃ ২৪৭

৪. শিশিরকুমার দাশ, *ভাষা জিজ্ঞাসা*, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১ জৈষ্ঠ ১৮২০, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ৫১

৫. পবিত্র সরকার, *ভাষা দেশ কাল*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জৈষ্ঠ ১৪১৯, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃ ১৬৫

গ্রন্থপঞ্জি

১. পবিত্র সরকার, *ভাষা দেশ কাল*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জৈষ্ঠ ১৪১৯, তৃতীয় মুদ্রণ

২. মৃণাল নাথ, *ভাষা ও সমাজ*, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, জানুয়ারি ১৯৯৯

৩. শিশিরকুমার দাশ, *ভাষা জিজ্ঞাসা*, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১ জৈষ্ঠ ১৮২০, পঞ্চম সংস্করণ

৪. উদয়কুমার চক্রবর্তী, *ভাষাবিজ্ঞান*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬, প্রথম প্রকাশ

৫. তাপস ভৌমিক (সম্পাঃ), পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা, কলকাতা: *কোরক*, জানুয়ারি ২০০৯, প্রথম প্রকাশ

৬. Trudgill, Peter. *Sociolinguistics : an introduction to language and society*. England : Penguin Books, 2000, Fourth Edition

৭. Wardhaugh, Ronald. *An Introduction to Sociolinguistics*. UK : Blackwell Publishing Ltd, 2006, Fifth Edition

৮. Philipson, Robert. *Linguistic Imperialism*. Oxford : Oxford University Press, 2008, Sixth Impression

৯. Wright, Sue : *Language Policy and Language Planning : From Nationalism to Globalisation*. New York : Palgrave Macmillan, 2004, First Edition

১০. Bright, William. *Sociolinguistics : Proceedings of the UCLA Sociolinguistics Conference*, 1964. The Hague : Mouton & Co Publishers, 1985, Second Printing